দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

156

# অবহেলিত প্রাথমিক শিক্ষা

সরকারের উচ্চ পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়। তা সত্ত্বেও গ্রামের দিকে প্রাথমিক শিক্ষার দুর্গতি চোখে পড়ার মত। যুগের পর যুগ ধরে এ অবস্থা চলছে। পরিবর্তন যদি কিছু হয়ে থাকে সেটা কেবল বিভিন্ন সরকারের নতুন নতুন অঙ্গীকারের ক্ষেত্রেই। সেখানে অনেক উন্নতি হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু বাস্তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে কতদূর সেটাই প্রশ্ন।

নীলফামারী সদর থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের এক হতাশজনক চিত্র পাওয়া গেছে। এ থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। কর্মসূচী অনুযায়ী থানায় প্রাথমিক শিক্ষার উপযুক্ত সব শিশুকে স্কুলের আওতায় নিয়ে আসার কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ভিন্ন চিত্র। নীলফামারী সদর থানার একটি সরকারী প্রাথমিক স্কুলের যে বিবরণ সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে এটা পরিষ্কার যে, নিতান্ত অলৌকিক ক্ষমতা ছাড়া সেখানে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তবায়ন প্রায় অসম্ভব। স্কুল বলতে আছে একটি ভাঙাচোরা চালাঘর, তার আবার বেড়া নেই। আরও নেই ব্ল্যাকবোর্ড, টেবিল, চেয়ার। এরকম স্কুলে কয়জন শিশু আসবে এবং কেন আসবে সেটাই প্রশ্ন। জরিপে দেখা গেছে এই স্কুল এলাকায় প্রাথমিক স্কুলে পড়ার উপযুক্ত শিশুদের অর্ধেকেরও কম শিশুর স্কুলের খাতায় নাম আছে। বাস্তবে স্কুল করে আরও কম।

এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতি নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ বা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির যদি সামান্য মাথাব্যথা থাকতো, তাও কিছু আশা ভরসা ছিল। দুঃখজনক যে সেটাও নেই। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ওয়ার্ড কমিটির চেয়ারম্যান এবং সদস্যসচিব নিজেরাও জানেন না তাদের কমিটির কাজ কি। এরকম পরিস্থিতিতে প্রাথমিক শিক্ষায় কোন সাফল্য আশা করা যায় কি?

দেশের মানুষ গরীব। গরীব পিতামাতা তার সন্তানদের স্কুলে না পাঠিয়ে বরং দু'পয়সা রোজগারের জন্য ক্ষেতেখামারে কাজের সন্ধানে পাঠানই বেশি জরুরী বলে মনে করেন। এ অবস্থায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যকর করা কঠিন। তাই সীমিত আকারে এ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এ বছর থেকে প্রতি জেলায় অন্তত একটি করে থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। আশা করা গিয়েছিল, যথেষ্ট তোড়জোড় করে কর্মসূচী সফল করার ব্যবস্থা করা হবে। বছর প্রায় শেষ হতে চলেছে। অগ্রগতি কোথায়?

অন্যান্য এলাকায়ও যে প্রাথমিক শিক্ষার হালচাল সুবিধের নয়, পত্রপত্রিকায় তার খবর প্রায়ই পাওয়া যায়। নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ থানার প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রাথমিক স্কুলগুলো নামে থাকলেও পড়াশোনায় প্রায় নেই বললেই চলে। শিক্ষকরা না কি পারিবারিক ও গেরস্থালি নিয়েই ব্যস্ত থাকেন বেশি। স্কুলে পড়ানর কাজটি তাদের নিমিত্ত মাত্র। আমাদের সংবাদদাতা সরজমিনে গিয়ে দেখেন, একটি স্কুলের ছাত্রদের অধিকাংশই তাদের নিজেদের রোল নম্বর জানে না। পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র ইংরেজী অক্ষর চেনে না, যোগ অংক পারে না। স্কুলে তেমন পড়াশোনা হয় না। অথচ প্রাইভেট পড়ানোর রেওয়াজ সেখানেও চালু হয়ে গেছে। স্কুল মাস্টারদের কাছে দু'এক মাস প্রাইভেট পড়লেই প্রমোশন পাওয়া যায়। একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষককে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঁচটি ক্লাস একাই নিতে দেখা গেছে। অপর এক স্কুলে একজন শিক্ষিকাকে ঘিরে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় শ'খানেক ছাত্রছাত্রীকে পড়াশোনা করতে দেখা গেছে। থানার ৮টি প্রাইমারী স্কুলে মাত্র দু'জন করে শিক্ষক আছেন। শিক্ষকের পদ আছে ৩টি করে। বাকি ১ জন করে শিক্ষক সে সব স্কুলে নিয়োগপ্রাপ্ত আছেন কি না, বা থাকলে তারা স্কুলে হাজির না থেকেও নিয়মিত বেতন নিচ্ছেন কি না; সেখবর স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষও রাখেন না।

পত্রিকান্তরে আর একটি অভাবনীয় খবর পাওয়া গেল। বগুড়া জেলার সারিয়া কান্দি থানা এলাকায় প্রায় ৩৪টি অস্তিত্বহীন স্কুলের শিক্ষকরা না কি বছরের পর বছর ধরে নিয়মিত বেতনভাতা গ্রহণ করে চলেছেন। এক সময় এসব স্কুল ছিল। কিন্তু গত ১৫ বছরে নদী ভাঙনে সে সব স্কুল তলিয়ে যায়। স্কুল নেই, ছাত্রছাত্রী নেই। অথচ তাদের নামে শিক্ষকরা বেতনভাতা পেয়ে চলেছেন। শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কাছে এর কোন ব্যাখ্যা আছে কি?

বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার এই হাল অবস্থা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় কেন আমাদের দেশে এত চেষ্টা করেও শিক্ষার হার বাড়ানো যাচ্ছে না। উপরতলায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উদ্যোগ আয়োজন যথেষ্ট করা হচ্ছে। এখন দরকার নিচের দিকে নজর দেয়া। সেখানে যদি প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ নট নড়নচড়ন নট কিচ্ছু অবস্থায় থাকেন, প্রাথমিক শিক্ষায় অগ্রগতি আশা করা যায় না।